সূচিপত্র

শিক্ষা-সমস্যা ৫৩
আমাদের প্রস্তাবিত পাঠ্যতালিকা ৭৩
পরিশিষ্ট ৯১

শিক্ষা-সমস্যা

বাঙ্গালী মুসলমানের জীবনের দিকে যখন দৃষ্টিপাত করি তখন দেখি, সে জীবন নিতান্ত হীন, নিতান্ত দরিদ্র, নিতান্ত সঙ্কীর্ণ। অর্থ বলুন, রুচি বলুন, আনন্দ বলুন, কিছুই সে জীবনে নাই। মানুষের জীবন ধারণের জন্য যতটুকু না হলে চলে না, সেইটুকু মাত্রই তার সম্বল। চতুর্দিক হতে তার সমস্ত সম্পদ সরে যাচ্ছে। সমাজের গৌরব যা দিয়ে বাড়াতে হয় তার কিছুই তার নাই বললে অত্যুক্তি হবে না। আজ বাঙ্গালী মুসলমান দর্শন, বিজ্ঞান, আর্ট, কোনটিতেই নাই। সম্পদ ও কল্যাণ যে পথে আসে, সে পথ তার পক্ষে রুদ্ধ হয়ে আছে। কেবল ভিক্ষুক, কারা-নিগৃহীত, লাঞ্ছিত, পরপদদলিত, পরাশ্রয় ভিখারির দল বেড়ে চলেছে। আজ প্রায় দেড়শত বৎসর হতে চলল ব্রিটিশ পতাকা এদেশে উড়ছে। সেই পতাকার তলে দাঁড়িয়ে হিন্দু আজ বিশ্বজ্ঞানের অধিকারী হয়ে বিশ্ব-সম্পদ আহরণ করতে শুরু করেছে। দর্শন, বিজ্ঞান, আর্ট প্রভৃতি সমস্ত বিভাগে হিন্দু আজ প্রতিপত্তি অর্জন করে স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্মের গৌরব বর্ধন করেছে। আর আমরা মুসলমান সমস্ত সম্পদের পথ রুদ্ধ করে অবনতির চরম সীমায় দ্রুত অগ্রসর হয়েছি। এই পার্থক্যের কারণ কি? কেন মুসলমানের এ দুর্গতি?

এ প্রশ্নের উতর এক কথায় দিতে গেলে বলতে হবে, আমাদের শিক্ষা নাই—আমরা জ্ঞানের সঙ্গে বহুদিন হতে বিরোধ করে বসেছি এবং দর্শন, বিজ্ঞান ও আর্টকে আমাদের শিক্ষাকেন্দ্র হতে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছি—এই ভয়ে, পাছে তাতে আমাদের ধর্ম নষ্ট হয়। ধর্ম আমাদের এতই নাজুক। ব্রিটিশের সঙ্গে ইউরোপের জ্ঞানদীপ্ত মন যখন এদেশে আসল এবং আমাদের আড়ষ্ট মনকে আঘাত করল তখন হিন্দু সে আঘাতে জেগে উঠে সে মনকে আলিঙ্গন দ্বারা বরণ করে নিল, আর আমরা সে আঘাতে জাগতে ত চাই-ই নাই বরং চোখ রাঙিয়ে সে মনকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি। ইউরোপের জ্ঞানকে আমরা প্রত্যাখ্যান করেছি, কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজ পর্যন্ত আমরা আমাদের সে নিদারুণ ভুলের কোন সংশোধনেরই চেষ্টা করি নাই। বরং সে ভুলকে বর্তমানে আমরা আরও জোর করে আঁকড়ে ধরেছি। অথচ এই বলে আমরা সান্ত্বনা পাই যে, একদিন মুসলমানই ইউরোপকে তার দর্শন-বিজ্ঞান শিখিয়েছিল। কিন্তু এটুকু আমরা বুঝি না যে, আজ আমরা কড়ার ভিখারি—আমাদের মুখে সে গর্ব, সে আস্ফালন আদৌ শোভা পায় না।

আজ যদি আমরা সে গৌরবের অধিকারী হতে চাই এবং তার দাবি করতে চাই তাহলে আবার আমাদের মধ্যে ইবনে খলদুনের মত ঐতিহাসিক, আলগাজালি, ইবনে রোশদ, ইবনে সিনার মত দার্শনিক, হজরত ওমরের মত চরিত্রবান রাষ্ট্রবিদ, জাবেরের মত বৈজ্ঞানিক, আবু

হানিফার মত তত্ত্বদর্শী প্রতিভার আবির্ভাব হওয়া চাই। তাহলে আমরা অতীতের সত্যকে প্রমাণ করতে পারব—নতুবা আমাদের মুখে সে অতীতের গৌরব-কাহিনী অন্যের নিকট অলীক উপকথা বলে প্রতীয়মান হবে। নিজেকে খাড়া করে, নিজেকে সৃষ্টি করে অতীতকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এরই নাম অতীতকে নূতন করে সৃষ্টি করা। এই নবসৃষ্টি সুশিক্ষার উপর নির্ভর করে। হিন্দু আজ নানা শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করে নানা জ্ঞানে বিভূষিত হয়ে তার অতীতের প্রতি বর্তমান জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করছে। আজ আমরা তাদেরও সমকক্ষ হতে পারছি না কেন? তার কারণ আমাদের সুশিক্ষার অভাব। আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি চিত-বিকাশ ও মস্তিষ্ক-সম্প্রসারণের অন্তরায় হয়েছে। এই শিক্ষা-পদ্ধতি কেমন করে যুগের প্রয়োজন মিটাতে পারে সেই হচ্ছে সমস্যার সমস্যা।

দেশের কল্যাণ-বৃদ্ধি যদি শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হয় তাহলে মোটের উপর বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি যে কি হিন্দু, কি মুসলমান কারও পক্ষে উপযোগী নয় তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু মুসলমানদের শিক্ষা-পদ্ধতি অনেকটা বিভিন্ন এবং তার ফলও বিভিন্ন—এজন্য আমি এস্থলে শুধু মুসলমানের শিক্ষা-সমস্যা সম্বন্ধেই বলতে চাই। এই শিক্ষাপদ্ধতির ফলে মুসলমান-সমাজ অনেকটা অন্যান্য উন্নতিমুখী জাতির উপর ক্রমশ বোঝা স্বরূপ হয়ে উঠেছে, তা এখনই ভাল করে সমঝে দেখা প্রয়োজন। বর্তমান জগতের যে যে দেশে মুসলমান আছে সেই সেই দেশে তাদের অবস্থা নিতান্ত হীন। তাদের দুরবস্থা তত্তৎদেশের অমুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নতির পরিপন্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেদিন আমাদের শ্রদ্ধেয় শহীদুল্লাহ সাহেবের পত্রে পড়লাম যে, ফ্রান্সের মুসলমান সম্প্রদায়ের অবস্থা বাংলার মুসলমানদের চেয়ে খুব ভাল নয়। গত বৎসর অধ্যাপক লিমের মুখে শুনেছিলাম, চীনের কোটি কোটি মুসলমান নিতান্ত দুঃস্থ, নিরক্ষর ও নির্বোধ। এ সমস্ত কথায় আস্থা স্থাপন আমরা না-ও করতে পারি কিন্তু একথা ঠিক যে, বর্তমান জগতের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য কোন দেশের কোন মুসলমান কোন উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি কিছুই করেন নি। বর্তমান দর্শন, বিজ্ঞান, আর্ট ঘেঁটে দেখুন মুসলমানের সৃষ্টি কিছু নাই বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। অবশ্য আমার জ্ঞানের পরিধি সীমাবদ্ধ। যদি কেউ আমাকে দেখিয়ে দিতে পারেন তবে আমি খুব বাধিত হব। কিন্তু যদি এই কথা সত্য হয় তাহলে কি খুব লজ্জার কথা নয়? এই যে জ্ঞানের রাজ্যে মুসলমান একেবারে গরহাজির, এর কারণ কি? যে মুসলমান একদিন নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করে মানুষের শ্রী, কল্যাণ ও জ্ঞানকে বহুমুখী করে ছড়িয়ে দিয়েছিল তারই বংশধর আজ বিপুল অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন! এটা ভাববার কথা।

মুসলমানের এই দুর্গতির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ডক্টর Crozier তাঁর *Progress and Civilisation* গ্রন্থে বলেছেন,

"Islam did open up an outlet for social aspect of human thought and aspiration but soon its secret structure began to reveal itself and was found to be incapable of expansion, devoid of sympathy and fatal to material and intellectual advancement. The Koran professed to be not only a spiritual

revelation but a scientific treatise ; to close not only the book of inspiration but the book of knowledge. It accordingly discouraged all attempts of man to discover the order of the world and thereby to improve his condition ; while its central doctrine led him to repose indolently on the decrees of an inexorable fate. The consequence was under this belief human mind stagnated ; as we see at this hour in those nations that are deeply imbued with its spirit, progress, civilisation and morality lie rotting together."

অর্থাৎ, "সত্যই ইসলাম মানব-চিন্তার ও আকাঙ্ক্ষার সামাজিক দিকটা বিকশিত করবার জন্য একটা পথ উন্মুক্ত করেছিল ; কিন্তু শীঘ্রই ইহার মূল ভিত্তি ও গঠন প্রকাশিত হয়ে পড়ল—ফলে দেখা গেল ইহার উপর সৌধনির্মাণের আর উপায় নাই—এবং ইহা বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও জ্ঞান-বৃদ্ধির অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোরান যে কেবল ধর্মগ্রন্থ বলে দাবি করে তা নয়, ইহা সর্বজ্ঞানের ভাণ্ডার বলে পরিচিত। কোরানের আবির্ভাবে শুধু যে খোদার বাণী রুদ্ধ হয়েছে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানও রুদ্ধ হয়েছে। কোন পুস্তক নাই বা হবে না যা কখন কোরানের সমকক্ষ হবে, এই হল মুসলমানের ধর্মমত। কাজেই, এই বিশ্বাসের বশবর্তী মুসলমান জগতের রহস্য উদঘাটনের সর্বচেষ্টা ত্যাগ করেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার স্বকীয় জীবনের শ্রী ও সম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টাও ত্যাগ করেছে। তকদিরের উপর সমস্ত দোষ চাপিয়েই সে নিষ্কৃতি লাভ করতে চাচ্ছে। এতে মুসলমানের মন ও কর্মস্রোত রুদ্ধ হয়ে গেছে। তাই দেখতে পাই, যেখানে মুসলমান সেখানেই উন্নতি, সভ্যতা ও নৈতিক বল সমস্তই একধারে সরে যাচ্ছে।"

—একথা হয়ত ষোল আনা ঠিক নয় ; কিন্তু এর মধ্যে যে সত্যটুকুর ইঙ্গিত আছে সেটা আজ প্রণিধানযোগ্য।

এখন আমাদের ঘরের দিকে তাকাই। আজ আমরাও যে উন্নতিমুখী হিন্দু সম্প্রদায়ের সকল শুভ চেষ্টায় আমাদের দুর্বুদ্ধি ও দুর্গতির দ্বারা বিঘ্ন ঘটাচ্ছি তা বোধ হয় প্রমাণ করতে হবে না। তারই কারণ নির্ধারণ করা এ প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য। আজ আমাদের কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করতে হবে যে, ব্রিটিশ এদেশে পুরাপুরি আধিপত্য বিস্তার করেই দেশবাসীর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করেছে। প্রথমত সে ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু-মুসলমানের আইন-কানুন জানতে হলে তাদের পরিচিত ভাষা ও গ্রন্থের চর্চা করা প্রয়োজন। এজন্য ওয়ারেন হেষ্টিংস ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা মাদ্রাসা এবং জোনাথান ডানকান ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে বেনারসে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। কলিকাতা মাদ্রাসা সর্বপ্রথম ব্রিটিশ-প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাকেন্দ্র। সরকার এই উভয় শিক্ষাকেন্দ্রে প্রভূত অর্থ ব্যয় করতেন। ১৭৮৪ অব্দে বাংলার এসিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আরবি ও সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তার দ্রুত চলতে থাকে। সার উইলিয়াম জোনস প্রমুখ পণ্ডিতগণের গবেষণায় আরবি ও সংস্কৃত বিদ্যার চর্চা বহুল পরিমাণে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। ১৮১৩ অব্দে লর্ড মিন্টো দেশীয় বিদ্যার সঙ্গে ইউরোপীয় জ্ঞান-চর্চার প্রস্তাব করেন। কিন্তু ১৮২৩ অব্দ পর্যন্ত মিন্টোর প্রস্তাব কার্যে পরিণত করা হয় নাই। ১৮২৩ অব্দে উক্ত টাকা আরবি ও সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ মুদ্রিত করার জন্য ব্যয় করা হয়।

ইতিমধ্যে দুইটি কারণের আবির্ভাবে সরকারের শিক্ষা-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হয়। প্রথম কারণ খ্রিস্টান পাদ্রিদের চেষ্টা এবং দ্বিতীয় কারণ ইউরোপীয় শিক্ষার জন্য কলিকাতায় তৎকালীন চিন্তাশীল দুরদৃষ্টিসম্পন্ন হিন্দু-নেতৃবর্গের স্বতঃপ্রণোদিত দাবি ও আন্দোলন। স্কটিস চার্চ কলেজ ও মাদ্রাজ খ্রিস্টিয়ান কলেজ পাদ্রিদের কীর্তি ; আর হিন্দু কলেজ হিন্দুনেতৃবর্গের সেই আন্দোলনের ফল। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বিবৃত করবার প্রয়োজন এখানে নাই ; কিন্তু যে মহাপুরুষ এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণ ছিলেন তাঁর দুই-একটি কথা এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন মনে করি। রাজা রামমোহনই সর্বপ্রথম 'ইউরোপীয় শিক্ষার জন্য ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করেছিলেন। ইংরেজি শিক্ষা আরদ্ধ হওয়ার পূর্বেই তিনি ইংরেজিতে দক্ষ হয়েছিলেন ; শুধু ভাষায় নয়, ইংরেজি দর্শন, ইতিহাস ও কালচারে তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ হয়েছিলেন। তখনও দেশে ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। রামমোহন শিক্ষা-ক্ষেত্রে নূতন প্রণালি অবলম্বন করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। এই নব-পদ্ধতি দ্বারা তিনি দেশবাসীর গতানুগতিক স্থিতিশীল মনের উপর পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছিলেন। তিনি স্বয়ং অতীতের কুসংস্কার ও ধারণা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত উজ্জ্বল হয়ে দেশবাসীকে গলা ছেড়ে এই নব-শিক্ষায় আহ্বান করেছিলেন। কলকাতায় যখন প্রথম সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হয় তখন তিনি তাঁর প্রতিবাদ বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন। তিনি সংস্কৃত কলেজের পরিবর্তে আধুনিক আর্ট কলেজের আদর্শে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ জেমস বলেন, "To him must be ascribed the introduction of liberal education in Bengal." অর্থাৎ, বাংলার আধুনিক শিক্ষার জন্য সমুদয় বাহাদুরি রামমোহনের প্রাপ্য। তিনি এই সম্পর্কে বড়লাট লর্ড আমহার্স্টকে যে পত্র লিখেন তার মধ্যে তিনি সংস্কৃত শিক্ষার বিরুদ্ধে অনেক কথা প্রকাশ করেন। এ স্থলে তিনি (রামমোহন) বলেন,

"This Seminary (proposed Sanskrit School) similar in character to those which existed in Europe before the time of Lord Bacon, can only be expected to load the minds of youth with grammatical niceties and metaphysical distinction of little or no practical use to the possessors or to society."

অন্য এক স্থলে তিনি বলেন, "It had been intended to keep the British nation in ignorance of real knowledge. The Baconian philosophy would not have been allowed to displace the system of the Schoolmen which was the best calculated to perpetuate ignorance. In the same manner, the Sanskrit system of education would be the best calculated to keep this country in darkness, if such had been the policy of the British legislature, But as the improvement of the native population is the object of the Government, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction, embracing Mathematics, Natural philosophy, Chemistry, Anatomy with

other useful sciences which may be accomplished with the sums proposed by employing a few gentlemen of talent and educated in Europe and providing a college furnished with necessary books, instruments and other apparatus."

এই পত্রে স্পষ্ট বুঝা যায় যে ফারসি, আরবি ও সংস্কৃত শিক্ষায় যে এদেশের কোন কল্যাণ সাধিত হবে না এবং ইংরেজি শিক্ষা ব্যতীত যে দেশের কুসংস্কার দূরীভূত হবে না, তা রামমোহন সম্যকরূপে উপলব্ধি করেছিলেন। এই দূরদর্শিতার ফলে এদেশের যুগসঞ্চিত দৃঢ়নিবন্ধ ধারণাকে উচ্ছেদ করতে তিনি যে বিপুল সহায় হয়েছেন তা বলাই বাহুল্য। বাংলা তথা ভারতের সৌভাগ্য যে, সে যুগে রাজা রামমোহনের মত মহাপুরুষ জন্মেছিলেন এবং তার সঙ্গে মহাচেতা ডেভিড হেয়ার ও স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট সংযুক্ত হয়েছিলেন।

কিন্তু দুঃখের সহিত লিখতে হবে যে, সে যুগে, এমনকি আজ পর্যন্ত মুসলমান সমাজে রামমোহনের মত পাশ্চাত্য-জ্ঞানদীপ্ত প্রতিভার আবির্ভাব হয় নাই। রামমোহন যখন পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য আন্দোলন করেন তখন মুসলমান রাজ্যহীন হয়ে ক্ষোভে দুঃখে ইংরেজকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখতে থাকে, সুতরাং ইংরেজি শিক্ষার কথা তার মুখে উঠতেই পারে না। মানুষ সাধারণত প্রাচীনপন্থী স্থিতিশীল। শিক্ষাক্ষেত্রে এ কথাটি আরও সত্য। ওয়ারেন হেস্টিংস এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মুসলমান সমাজকে স্থির করবার জন্য কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপিত করেন। দূরদর্শী হিন্দু নেতৃবর্গ কালবিলম্ব না করে এবং মুসলমানের মত আক্ষেপে দিন না কাটিয়ে পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করবার জন্য হিন্দু কলেজের ভিত্তি স্থাপন করেন ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে। হিন্দু কলেজ কালক্রমে প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত হয়। মুসলমান সমাজ কলকাতা মাদ্রাসা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকল। কলকাতা মাদ্রাসার পর চট্টগ্রাম, ঢাকা, হুগলি মাদ্রাসা ব্যতীত সরকার ১৯২৬ সালের পূর্ব পর্যন্ত বাঙালি মুসলমানদের জন্য অন্য কোন শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন নাই। কিংবা ১৯২৬ সালের প্রতিষ্ঠিত সা'দাত কলেজ ব্যতীত মুসলমান সমাজ স্বাধীনভাবেও আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য কোন শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন নাই। তার কারণ, মুসলমান সমাজে তার জন্য তীব্র কোন আন্দোলন হয় নাই। হিন্দু নেতৃবর্গ যা ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠা করতে সরকারকে বাধ্য করেছিলেন তাই মুসলমান সমাজ পেয়েছে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে মাত্র ১৯২৬ সালে। এই হিসাবে ধরলে বলতে হবে মুসলমান সমাজ হিন্দু সমাজের একশত নয় বৎসর পশ্চাতে। এই এক শত নয় বৎসরের জের যদি পূরণ করতে হয় তাহলে যে আজ মুসলমানকে কি করা উচিত তাও মুসলমান নেতৃবর্গ অবগত নন। যদি ১৮১৭ সালের হিন্দু কলেজের শিক্ষকদের সহিত বর্তমান ইসলামিয়া কলেজের শিক্ষকদের তুলনা করি তাহলে বুঝতে পারা যায় মুসলমান সমাজে প্রকৃত শিক্ষার জন্য কোন ক্ষুধা নাই কিংবা তার জন্য কোন আকাঙ্ক্ষাও নাই। ডিরোজিওর মত শিক্ষক হিন্দু সমাজের শিক্ষাকে কতখানি উন্নত করেছেন তা ভাবলে সত্যই ইসলামিয়া কলেজের ব্যবস্থা দেখে নিতান্ত নিরাশ হতে হয়। বর্তমান মুসলমান সমাজ কি ডিরোজিওর মত লোককে আর এখন পেতে পারেন? কখনও নয়। এমন অবস্থায় ইসলামিয়া কলেজে যে

সমস্ত বিষয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে তা আরও অধিকতর উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের হাতে দেওয়া উচিত ছিল। এইরূপ অল্প উপকরণ দিয়ে এই কলেজ কেমন করে মুসলমানের জ্ঞানকে প্রস্ফুটিত করতে সমর্থ হবে তা ভেবে পাই না। যে সমস্যার সমাধান-কল্পে হিন্দু-সমাজ হিন্দু কলেজ পেয়েছিল আজ একশত বৎসর পরে আমাদের সেই সমস্যাই বিষম হয়ে দাঁড়িয়েছে ; কিন্তু ঐ সমস্যা ঠিক ১৮১৭ সালের ব্যবস্থা দ্বারা সমাধান করলে প্রকৃত সমাধান পাওয়া যাবে না। আজ আমাদের নূতন করে সে সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে।

একশত বৎসর পূর্বে হিন্দু সমাজ সংস্কৃত শিক্ষাকে দূরে সরিয়ে পাশ্চাত্য জ্ঞানকে বরণ করেছিল—আর একশত বৎসর পরে আমরা সেই আরবি শিক্ষাকেই পুনঃপ্রবর্তিত করছি নব-প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাসমূহে। প্রাচীন শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করে যে প্রকৃত শিক্ষা হয় না, সে বুদ্ধি আজও আমাদের হয় নাই। আজ তাই আমরা প্রাচীন শাস্ত্রের সঙ্গে একটুখানি ইংরেজি জুড়ে দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা দিচ্ছি।

সেনসাস ঘেঁটে দেখি, একটি হিন্দু ছেলে ৮ বৎসর বয়সে যা আয়ত করে ঠিক তাই আয়ত করে একটি মুসলমান ছাত্র ১১ বৎসর বয়সে। কাজেই শিক্ষাক্ষেত্রে, বিশেযত উচ্চশিক্ষায় মুসলমান হিন্দুর কাছে হটে যেতে বাধ্য। এর কারণ মুসলমানদের ধর্মশিক্ষার জন্য উৎকট উদ্বিগ্নতা। শিশু কথা না বলতে শিখতেই দুর্বোধ্য আরবি শব্দের সঙ্গে লড়াই করতে বাধ্য হয়। হয় পিতা না হয় শিক্ষক বেত্রহস্তে সেই আরবি শব্দ কণ্ঠস্থ করাতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। প্রতিদিন প্রাতে যখন শিশু প্রকৃতির মনোরম দৃশ্যের সহিত একটু পরিচয় করবে ঠিক সেই সময় তাকে কোরান শরিফ বগলে কি কাঁধে করে মসজিদে যেতে হয়। সেখানে উস্তাদজির সেই নিদারুণ বেত্রাঘাতের সহিত তার জীবন-যুদ্ধ আরম্ভ হয়। সেই নিষ্ঠুরতার মধ্যে মুসলমান ছাত্রের ধর্মশিক্ষা আরম্ভ হয়। অতিকষ্টে আরবি শব্দ কণ্ঠস্থ করতে করতে তার শিক্ষার প্রতি তীব্র ঘৃণার উদ্রেক হয়। সুকুমার-মতি শিশু অনেকেই এই নিষ্পেষণের চাপে একেবারে ভেঙে পড়ে। একদিকে তাদের সমুখে আরবি ভাষা অন্যদিকে উস্তাদজির তাম্বি ও বেত্রাঘাত—এই উভয় সঙ্কটের মধ্যে মুসলমান শিশুর শিক্ষা শুরু হয়। এই জবরদস্তির ফল যে বিষময় হয়েছে সমাজপতিরা আজও তা খতিয়ে দেখছেন না—কোরান খতম করে অনেকেই শিক্ষার হাত হতে চির-বিদায় গ্রহণ করে এবং উতরকালে তারাই নানাবিধ অধর্মের অনুষ্ঠান করে। কোন দার্শনিক বলেছেন, morality enforced is immorality in fact. জবরদস্তিতে ধর্ম শিক্ষা দিলে তার ফল বিপরীত ফলে। মুসলমান সমাজের মধ্যে আজ যারা নানা কু-আচরে লিপ্ত তাদের বাল্যজীবনের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে তাদের অনেককেই উস্তাদজির একমাত্র সম্বল সেই বেত্রাঘাত খেতে হয়েছে এবং সেই বেত্রাঘাতই তাদেরকে বিপথে চালিয়েছে। শিক্ষার প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা যে এহেন কোরান শিক্ষার আশু ফল তা প্রমাণ করার জন্য বেশি কষ্ট পেতে হয় না। যে সমস্ত ছাত্র মসজিদে কোরান পড়েছে তাদের কয়জন শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি করেছে? আর যারা সৌভাগ্যক্রমে কোরান শিক্ষার পর বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে তারা সাধারণত পরিণত বয়স্ক—কিন্তু তাদের মস্তিষ্কের শক্তি দুর্বোধ্য ভাষা কণ্ঠস্থ

করতে করতে যথেষ্ট পরিমাণে কাহিল হয়ে পড়ে এবং তাদের মানসিক স্ফূর্তি একেবারে থাকে না। এমন অবস্থায় মুসলমান ছাত্র অনেকটা আধমরা হয়েই যেন শিক্ষা লাভ করতে যায়। তার নিকট হতে বেশি আশা করাই বাতুলতা। এজন্য আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে দায়ী।

ব্রিটিশের প্রতি বিদ্বেষবশত মুসলমান সমাজের সারথিগণ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে ফতুয়া জারি করলেন। সে ফতুয়ার বিষময় ফল আজও সমাজের শিরায় শিরায় বর্তমান। কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পর মুসলমান শিক্ষার্থী মাদ্রাসাতেই ভর্তি হয়েছে, কিন্তু ইংরেজি বিদ্যালয়ে খুব কম আকৃষ্ট হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষাই বাঙ্গালী মুসলমানের জীবনে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছে। মাদ্রাসা হতে উত্তীর্ণ হয়ে মৌলভি সাহেবগণ গ্রামে গ্রামে ধর্মশিক্ষা দিয়ে স্ব স্ব উদরান্নের সংস্থান করেছেন। তাঁদের সেই ধর্ম-ব্যবসায়কে উঞ্ছবৃত্তি ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। তাঁরা পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে নিরক্ষর গোমরাহ নির্বোধ মুসলমানকে শিষ্যত্বে বরণ করে তাদের মূর্খতাকে ক্রমশ পাকিয়ে তুলেছেন। যে সমস্ত উপাখ্যান, উপকথা আউড়ে তাঁরা ইসলামের সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করেছেন এবং ইসলামের প্রবর্তক মহাপুরুষ মুহম্মদ (দ) কে নানা কুসংস্কারের আবর্জনায় আবৃত করে তাদের সমুখে ধরেছেন এবং তদ্দ্বারা শ্রমক্লান্ত পানাহার-অন্বেষণে সদা-ব্যস্ত পল্লীবাসী মুসলমানদের ধারণা ও বুদ্ধিকে যেরূপে বিকৃত করেছেন তাতে আজ তারা এক অপরূপ জীবে পরিণত হয়েছে। তাদের জীবনে শ্রী নাই—তারা দুনিয়ার সৌন্দর্য, সম্পদ, সুখ বৃদ্ধির জন্য কোন আকাঙ্ক্ষাই পোষণ করতে শিখে নাই। কালক্রমে শিক্ষা ও সম্পদ অর্জনের উপযোগী জ্ঞানের অভাবে যখন গ্রাম্য মুসলমানের সঙ্গতি কমতে শুরু করল ও সঙ্গে সঙ্গে মৌলভি সাহেবগণের উঞ্ছবৃত্তিও অর্থলাভের প্রতিকূল হতে লাগল, তখনই তাঁরা অর্থকরী অর্থাৎ 'চাকরি করা' বিদ্যা ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করলেন। তখন ইংরেজি শিক্ষা জায়েজ করবার জন্য নানা হাদিস খুঁজে বের করা হল। তাঁরা গ্রামে গ্রামে দুই একটি ছেলেকে ইংরেজি বিদ্যালয়ে দিতে থাকলেন এবং তাদের আদর্শ দেখে নিরক্ষর পল্লীবাসী মুসলমানও ইংরেজি বিদ্যালয়ের পক্ষপাতী হল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইংরেজি বিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্র ক্রমাগত বর্ধিত হয়েছিল। ১৮৭৪ অব্দে ক্রফট সাহেব তাঁর রিপোর্টে লেখেন, "অবস্থাপন্ন মুসলমান ছাত্র ইংরেজি বিদ্যালয়ে দ্রুত প্রবেশ করেছে।" দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি দেখান, "১৮৭২ অব্দে ঢাকা বিভাগে মাত্র ৮৫৬ জন মুসলমান ছাত্র ছিল এবং ১৮৭৪ অব্দে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে ১৩২৬১ ছাত্র হয়।" ভূদেব বাবুও বলেন, "দিনাজপুর, বগুড়া, জলপাইগুড়ি, পাবনা প্রভৃতি জেলার ভদ্র মুসলমানগণ কোরান শিক্ষা ব্যতীত আরবি বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে না-পসন্দ করেন এবং ক্রমশ ইংরেজি বিদ্যালয়গুলি তাঁদের আদরণীয় হয়ে উঠছে।"

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আরবি শিক্ষার প্রতি মুসলমান জনসাধারণের বিশ্বাস ও ভক্তি এবং ইংরেজি শিক্ষার প্রতি বিদ্বেষ অক্ষুণ্ণ হয়ে রইল। বিশেষত মাদ্রাসা হতে উত্তীর্ণ মৌলভি সাহেবগণ তাঁদের পেশা বহাল রাখবার জন্যই হোক বা অন্য কারণেই হোক ঐ বিশ্বাস (credulity) অটল করে রাখতে সহায় হলেন। পক্ষান্তরে ইংরেজি-শিক্ষিত মুসলমান আরবি

শিক্ষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলেন। এইরূপে মুসলমান সমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায় দুইটি বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়লেন। উভয় দলের সঙ্গে কোন রফা বা বনিবনাও হল না ; বরং একে অপরের নিন্দা অপবাদ দিয়ে সমাজের জনসাধারণকে বিব্রত করতে লাগলেন। জনসাধারণ মৌলভি সাহেবদেরই প্রভাবে যুগসঞ্চিত কুসংস্কারপীড়িত হয়ে ইংরেজি শিক্ষিতগণকে ঘৃণা করতে লাগল। তারা তাদের প্রচারিত ধর্মবিশ্বাসের প্রভাবে 'যে তিমিরে সেই তিমিরেই' পড়ে থাকল। প্রকৃত শিক্ষার কথা কানে কে পৌঁছায়? ইংরেজি-শিক্ষিতগণ সরকারের চাকুরিতেই জীবন কাটাতে লাগলেন। ফলে মুসলমান সমাজে চিন্তাশীল লোকের আবির্ভাব হল না। ইংরেজি ও আরবি শিক্ষিতের পরস্পর দ্বন্দ্ব-দ্বেষাদ্বেষি প্রবল থেকে প্রবলতর হতে লাগলো। ইংরেজি শিক্ষা দ্বারা আরবি শিক্ষাকে আধুনিক দর্শন-বিজ্ঞানের প্রভাবে নতুন করে প্রবর্তিত করবার কথা মুসলমান সমাজের মনে জাগল না। আরবি শিক্ষা যে আধুনিক জগতের জীবন-সমস্যা সমাধানের অনুকূল নয়, সে কথাও মুসলমান আদৌ বুঝল না। মধ্যযুগের প্রবর্তিত কালাম, মনতক, বালাগাৎ শিক্ষার জন্য শক্তি ও অর্থ ক্ষয় যে বর্তমান যুগের পক্ষে অনেকখানি নিরর্থক, সে কথা গলা ছেড়ে বলবার মত শক্তিমান পুরুষের আবির্ভাব আজও মুসলমান সমাজে হয় নাই। ইংরেজি ও আরবির যে সমন্বয়ে বর্তমান যুগের প্রয়োজন সিদ্ধ হতে পারে তেমন সমন্বয়ের চেষ্টাও আজও হয় নাই। ফলে, ইংরেজি-আরবি দ্বন্দ্ব এখনও প্রবলরূপে বিদ্যমান থাকায় সমাজ-মনের ঋজুতা ও একাগ্রতা সম্ভবপর হচ্ছে না।

কিন্তু এই দ্বন্দ্ব চুকিয়ে ফেলবার জন্য কিছু চেষ্টা যে হয় নাই, তা বলা যায় না। দুঃখের বিষয়, সে চেষ্টায় এমন কোন শক্তিমান পুরুষের হাত পড়ে নি—যাঁর জ্ঞান ও রুচি প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সংযোগ সাধন করতে পারে এবং মুসলমানের মুক্তির জন্য যাঁর বুদ্ধি ও অনুভূতি সম্পূর্ণ সজাগ। যে চেষ্টা হয়েছে তার ফলে ১৯১২ সালে পুরাতন আরবি মাদ্রাসাগুলির পরিবর্তে নূতন মাদ্রাসা ও মক্তব প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিবর্তন কিছুই হয় নাই—পাঠ্য তালিকায় ইংরেজি ও বাংলা সংযুক্ত হয়েছে মাত্র। পুরাতন শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করার ব্যবস্থা যেমন তেমনি রয়েছে। ইংরেজি যুক্ত হয়েছে, কেননা তা না হলে চাকরী পাওয়া দুষ্কর। সরকারের ঘরে চাকরি জুটাতে হলে ইংরেজি জানা দরকার—কিন্তু জনসাধারণ শুধু ইংরেজি শিখতে নারাজ অথচ চাকরির জন্য উদ্বিগ্ন। এমন অবস্থায় ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত না করে কিংবা আধুনিক জগতের দাবির দিকে লক্ষ্য না করেই নব মাদ্রাসা-শিক্ষা-পদ্ধতি করা হল। তাতে পুরাতন মাদ্রাসার সমস্তই থাকল, কেবল এক ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা ও উর্দুর পরিবর্তে বাংলা শিখবার ব্যবস্থা করা হল। এই পদ্ধতি মুসলমান সমাজের যে মনঃপূত হয়েছে তা সরকারের কাগজ-পত্র হতে প্রমাণ করা যায়। মুসলমান জনসাধারণ এখন ছাত্রকে মধ্য-ইংরেজি বা উচ্চ-ইংরেজি বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে পাঠায় জুনিয়র ও সিনিয়র মাদ্রাসায়। তাদের ধারণা, এক গুলিতে দুই বাঘ পড়বে—দ্বীনও হবে দুনিয়াও হবে। ছেলেরা ইংরেজি শিখে কাফের হবে না ; তাদের লুঙ্গি, টুপি, কুর্তা সমস্তই ঠিক থাকবে—মনের মধ্যে কোন বদ-খেয়াল ঢুকবে না ; মাতা-পিতার আর শঙ্কার কারণ থাকবে না। এমন চমৎকার শিক্ষা-পদ্ধতি আর কোথায় পাওয়া যাবে? এইরূপে জনসাধারণের অন্ধ বিশ্বাসকে (credulity) এমনি করেই ব্যবহার করা হয়েছে যে

M. E. ও H. E. school হতে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। শিক্ষা-বিভাগের রিপোর্টে দেখি :

	১৯২৩-২৪	১৯২৪-২৫	১৯২৫-২৬
H. E. school	শতকরা ১৫.২ ٪	শতকরা ১৪.৪ ٪	১৩.২ ٪
M. E. school	শতকরা ১৯.৪ ٪	শতকরা ১৮.৫ ٪	১৬.৪ ٪

কারণ মক্তব ও নব-প্রবর্তিত মাদ্রাসা ক্রমশ বেড়ে চলেছে এবং মুসলমান অভিভাবক এই মাদ্রাসাতেই ছাত্র পাঠাতে অতিশয় উদ্বিগ্ন।

	১৯২৩-২৪	১৯২৪-২৫
মাদ্রাসা	৩৪৬	৩৭৪
ছাত্র	২৬,১৫৬	৩১,৬১৩
সরকারি ব্যয়	৩,৩৯,২৯৬ টাকা	৬,১৯,৭৭৬ টাকা

শতকরা ৪২জন মুসলমান ছাত্র মক্তবে পড়ে। নব-মাদ্রাসার শিক্ষা যে আদরণীয় হচ্ছে, তার কারণ—ইহাতে আরবি ও ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু ভালো করে বিচার করে দেখলে দেখা যাবে যে, এই শিক্ষায় মুসলমান সমাজের জীবন শ্রী-সম্পন্ন হবে না—তার মন জাগবে না—রুচি ফিরবে না—বুদ্ধি বিকশিত হবে না—জগতের জ্ঞান গ্রহণ করতে তার শক্তিও বাড়বে না। শুধু ভাষা শিখলেই যে জ্ঞান বর্ধিত হয়, বুদ্ধি বিকশিত হয়, মন সম্প্রসারিত হয়, কর্মশক্তি বাড়ে এরূপ ধারণার বশবর্তী হয়েই বোধ হয় প্রবর্তকগণ নব-মাদ্রাসা-শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু শিক্ষাতত্ত্ববিদগণ এক বাক্যে বলবেন, এরূপ ধারণা নিতান্ত ভুল। মন বিকশিত ও বুদ্ধি সজাগ করতে যে-সমস্ত বিষয় বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ ছাত্রের সামর্থ্যানুসারে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন, সেগুলি প্রকৃষ্ট উপায়ে শিক্ষার ব্যবস্থা যে শিক্ষা-পদ্ধতিতে থাকে না সে পদ্ধতি জীবন-সমস্যা সমাধান করতে পারে না। যে শিক্ষার সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক নাই—সে শিক্ষা পঙ্গু। যেমন, যে জীবনের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক নাই সে জীবন অন্ধ। যে শিক্ষা হৃদয় প্রশস্ত করে না—বুদ্ধিকে জাগ্রত করে না—চিতকে মার্জিত করে না—সংস্কার হতে মুক্তি দেয় না, সে শিক্ষা জাতির প্রাণ বিনাশ করে। সঙ্কীর্ণ মন নিয়ে কোন জাতি টিকে থাকতে পারে না।

শ্রদ্ধেয় প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বলেছেন, "মনোজগতে যে জাতি একঘরে সে জাতি পতিত।"

মাদ্রাসা শিক্ষার পরিণাম চিন্তা করলে আমার ঐ কথাটাই মনে পড়ে। আজ নব-মাদ্রাসায় বর্তমান জগতের দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস বা আর্ট কিছুরই স্থান নাই, অথচ যে-সমস্ত শিক্ষা-কেন্দ্রে এই সমস্ত বিষয়ের স্থান করা হয়েছে সেখানে মুসলমান যাচ্ছে না। আর কিছুকাল পরে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা সাধারণ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নিতান্ত কম হয়ে যাবে। তখন এই নব-মাদ্রাসা হতে উত্তীর্ণ ছাত্রগণও তাদের সঙ্কীর্ণ-মন, স্বল্প-দৃষ্টি, আড়ষ্ট-বুদ্ধি নিয়ে মুসলমান সমাজকে জগতের অন্যান্য শক্তিমান্ জ্ঞানদীপ্ত জাতির সমুখে নিতান্ত হেয় বলে

অকাট্য সত্য বলে শিক্ষার্থীকে মেনে নিতেই হয়। সে তার পারিপার্শ্বিক জীবন হতে লব্ধ-জ্ঞান দ্বারা সে সূত্রকে সমালোচনা করতে পারে না। সে শিক্ষা তাকে দেওয়া হয় না। এই যে শুধু 'মেনে নেওয়া' এর চেয়ে শিক্ষার বিড়ম্বনা আর কি হতে পারে? এতে চিত্তবৃত্তি বিকশিত হয় না, বুদ্ধি স্তম্ভিত বিড়ম্বিত হয়ে ক্রমশ জড়তায় আচ্ছন্ন হতে থাকে। ধারণাশক্তি এতে রুদ্ধ হয়ে যায়। চিন্তাস্রোতে ভাটা পড়ে। মাদ্রাসা-শিক্ষা মস্তিষ্কের খাদ্য যোগায় না। গণিত—যাতে বুদ্ধি বিকশিত হয়—তার মাত্র যৎকিঞ্চিত শিক্ষা দেওয়া হয়—তার মধ্যে আবার বীজগণিত বা Algebra গরহাজির। বর্তমান Logic, বর্তমান ইতিহাস ভূগোল—যাতে মনের স্ফূর্তি হয়—দৃষ্টি খোলে—হৃদয়বৃত্তি বিকশিত হয়—তার স্থান মাদ্রাসায় নাই। মাদ্রাসার ইতিহাসের পাঠ্য-সীমা দেখলে মনে হয় ইসলামের ইতিহাস যেন হজরত আলীর সঙ্গে সমাপ্ত হয়েছে। খোলাফায়ে রাশেদুনের পরের ইতিহাস যেন পাঠ্যোপযোগীই নয় এদের নিকট। জগতের সঙ্গে পরিচয় করতে হলে যে সমস্ত বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন মাদ্রাসায় তার কিছুরই ব্যবস্থা হয় নাই। সাহিত্য ও কাব্য যাতে জীবনের রুচি ও সৌন্দর্যজ্ঞান বর্ধিত হয় তারও স্থান অতি সামান্য। এই শিক্ষায় ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মজীবন দুটী পৃথক করতে শেখায় না। এতে এই ধারণা জন্মায় যে ধর্মশাস্ত্র কণ্ঠস্থ করলেই ধর্মজীবন লাভ করা যায়। ফলে, অনেক মৌলবি সাহেব ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়েও নিতান্ত গর্হিত জীবন যাপন করেন। তাঁরা কিছুতেই বুঝেন না ধর্মজীবন যাপন করতে হলে শুধু ধর্মশাস্ত্র কণ্ঠস্থ করলেই চলে না, সঙ্গে সঙ্গে জীবন যাপনের সমুদয় কায়দাকানুনও শিখতে হয়, হৃদয় ও মনোবৃত্তিগুলির চর্চা করতে হয়। ধর্মশাস্ত্রকে কণ্ঠস্থ করে সিকেয় তুলে রাখলে চলে না। তাকে অন্যান্য পুস্তকের সংসর্গে এনে আয়ত করতে হয়, বুঝতে হয়, জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হয় এবং তজ্জন্য আবশ্যক হলে কিছু কিছু ত্যাগও করতে হয়—কারণ জীবন আমাদের শাস্ত্রের চেয়ে সত্য। "জীবন নানা শাস্ত্রকে সৃষ্টি করে"—আজ আমাদের এই কথা ভাল করে বুঝে মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করতে হবে। নতুবা এজীবন সুন্দর ত হবেই না বরং ধর্মজীবনও আমাদের গর্হিত হতে থাকবে।

কেহ কেহ বলেন, মাদ্রাসায় ছেলেরা অল্প খরচে লেখা পড়া শিখতে পায়। ঠিক,—কিন্তু একথা হয়ত আপনারা জানেন—'সস্তার তিন অবস্থা'। সস্তা জিনিস সব সময়ই আক্রা। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর অনেকেই জায়গিরে থেকে পড়েন। এই জায়গিরে যাঁরা থাকেন তাঁদের জীবন অতি কঠোর। কিন্তু জায়গিরে থেকে শিক্ষা লাভ করে তাঁরা যতটুকু লাভ করেন আমার মনে হয় তাঁরা তার দশগুণ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন। জায়গিরে থেকে গৃহপ্রভুর হুকুম তামিল ও সুনজর বজায় করতে করতে শিক্ষার্থীর মানসিক অবস্থা যে দিন দিন কত হীন হয়ে পড়ে তা বর্ণনা করা যায় না—পরিণামে তাঁর চরিত্র যে দুর্বল হয়, তেজ ও সাহস যে ক্ষীণ হয়ে পড়ে তা বলাই বাহুল্য। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর দিকে দৃষ্টিপাত করলে বুঝা যায় তার জীবন কত ক্ষীণ, আকাঙ্ক্ষা কত দুর্বল—সাহস কত কম—মুখ বিশীর্ণ! সমস্ত চেহারাতে যেন তাঁর দৈন্য ফুটে পড়ছে; জীবনের স্বাদ যেন তাঁর ফুরিয়ে গেছে—কোন বস্তুতেই যেন তাঁর আর স্পৃহা নাই! এরূপ জীবন্মৃত হয়ে এই ঝঞ্ঝাপীড়িত সংসারে তাঁর পথ কেটে বের করতে হয়। কিন্তু সে পথ কাটতে যে শক্তির দরকার সে শক্তি অর্জন করার শিক্ষা মাদ্রাসা হতে পাওয়া যায় না।

তারপর মাদ্রাসায় যেরূপ প্রণালিতে শিক্ষা প্রদান করা হয় তাহাও শিক্ষার্থীর মনোবিকাশের অনুকূল নয়। শৈশবেই মাতৃভাষার সহিত পরিচয় ঘটবার আগেই আরবি প্রাথমিক ও তার উর্দু তর্জমা কণ্ঠস্থ করতে করতে শিশুর প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। ৮-১০ বৎসর বয়সেই একটী বালককে তিনটী ভাষা পড়তে হয়, আরবি, উর্দু ও বাংলা। তার দুই বৎসর পরই ইংরেজি তার উপর চাপে। ১২ বৎসর বয়সে তাকে চারিটী ভাষার সহিত যুঝতে যুঝতে জুনিয়ার মাদ্রাসার সীমা অতিক্রম করতে হয়। অবশ্য চারিটী ভাষা শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা সাধু কিন্তু method নিয়ে ও stage নিয়ে যত মুশকিল। কোন সময় কোন প্রণালিতে শিক্ষা দিতে হবে সেইটাই বিচার্য। নব মাদ্রাসায় যে প্রণালি অবলম্বন করা হয়েছে এবং যে stage এ ভাষার চাপ দেওয়া হয়েছে তা বিজ্ঞানসমত নয়। তাতে সুফল ফলতে পারে না। এজন্যই ১২ বৎসর পর্যন্ত পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই এইরূপ নিষ্ঠুর পাঠ্যপদ্ধতির চাপে অনেককে শিক্ষাক্ষেত্র হতে চিরবিদায় গ্রহণ করতে হয়। এই ব্যবস্থার বিহিত প্রতিকার সত্বর করা প্রয়োজন। নতুবা আর কিছু কাল পরে দেখব আমরা ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি বিভাগে চিরদিনের তরে গরহাজির হয়েছি। হিন্দু-সম্প্রদায় উতরোতর নানা জ্ঞান আহরণ করে শক্তিমান হবে আর আমরা অন্ধকারাচ্ছন্ন কূপে লুকিয়ে থাকব। জগতের সঙ্গে আমরা একেবারে যোগ হারিয়ে ফেলব। শুধু ইংরেজিভাষা আমাদের রক্ষা করবে না। ইংরেজি ভাষার সঙ্গে ইংরেজি দর্শন বিজ্ঞান কাব্য প্রভৃতি গ্রহণ করতে হবে-হজম করতে হবে, তার উপর আমাদের ধর্মশাস্ত্রের যুগধর্মসম্মত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করতে হবে। এজন্য আমাদের শিক্ষা একমুখী করতে হবে—কেমন করে করা দরকার তা ভাবতে হবে।

আজ আমাদের সকল দুর্গতির কারণ হচ্ছে আমাদের আড়ষ্ট বুদ্ধি—অন্ধবিশ্বাস, বর্তমান জীবন সম্বন্ধে ঔদাসীন্য এবং বর্তমান জগতের জ্ঞানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কহীনতা। তার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতি অনেকখানি দায়ী। মুসলমান সমাজের ঐক্য-সাধন বা একদিল করতে হলে আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি একমুখী করতে হবে—জগতের সমস্ত বিদ্যা বর্তমান জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। আজ আমাদের সকল শুভ চেষ্টা আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধিকে মুক্ত করতে নিয়োজিত হোক।

পূর্বে বলা হয়েছে, সাধারণত বাঙ্গালি মুসলমানের শিক্ষা ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দ হতে যুগধর্মকে অবজ্ঞা করে চলে এসেছে। ফলে, আজ তার সঙ্গে পড়শী হিন্দুজাতির cultural পার্থক্য এমন মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, তাতে উভয় সম্প্রদায়ের কোন প্রকার মিলন সম্ভবপর হচ্ছে না বরং একে অপরের গলা কাটতে প্রস্তুত হয়েছেন। এই মনোভাব দূর করতে হলে উভয়ের শিক্ষা অনেকটা একমুখী হওয়া চাই। সামাজিক আচার এবং ধর্মসঙ্গত আকায়েদ ও আমল (faith and practice) সম্পর্কে শিক্ষার ব্যবস্থা পৃথক হলেই চলতে পারে। তাছাড়া জাগতিক জ্ঞান গুণ শিক্ষার secular education এর জন্য উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষাক্ষেত্র এক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাহলে একে অপরকে ভাল করে জানতে পারবে। একে অপরের ত্রুটি, স্নেহ ও ক্ষমার চক্ষে দেখতে শিখবে। নতুবা ভিন্ন ভিন্ন communal school ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে কেবল সঙ্কীর্ণতাচর্চাই সার হবে। ফলে দেশের কোন প্রচেষ্টাতেই উভয় সম্প্রদায় একই

পরিদৃষ্টি (outlook) দিতে সক্ষম হবে না। তাহলেই ঝগড়া ফাসাদই প্রবল হতে থাকবে। আসল সমাধান এর দিকে সমবেত চেষ্টা কেন্দ্রীভূত হবে না। এজন্য আজ **আমি বাঙ্গালী মুসলমানের শিক্ষা-সমস্যাকে সমগ্র ভারতের জাতীয় সমস্যা বলতে চাই**। পূর্বে আমি দেখাতে প্রয়াস পেয়েছি যে, আমাদের শিক্ষা সংস্কারের evolution এর ফলে আমরা যে নব মাদ্রাসা প্রণালি পেয়েছি তা আমাদিগকে প্রকৃত শিক্ষা দিতে পারছে না। এই প্রণালির প্রবর্তক আশা করেছিলেন এর ফলে বাঙ্গলাদেশে কতকগুলি আধুনিক মোল্লা ছড়িয়ে পড়বেন, যাঁরা পুরাতন অন্ধসংস্কারাচ্ছন্ন মোল্লাগুলিকে সরিয়ে মুসলিম জনসাধারণকে তাদের মূর্খতা ও অজ্ঞতার নাগপাশ হতে মুক্তি দিতে সমর্থ হবেন। এই প্রণালির একমাত্র উদ্দেশ্য যদি শুধু মোল্লা তৈরি করাই হত তাহলে বোধ হয় এর সংস্কার করবার জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ ছিল না কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশত বাঙ্গালী মুসলমান এই প্রাণালীকে তার একমাত্র শিক্ষা প্রণালি মনে করে প্রতিষ্ঠিত স্কুল কলেজ বর্জন করে ছেলেপুলে সব দ্রুত মাদ্রাসায় পাঠাচ্ছেন।

বাংলার গ্রামে গ্রামে আজ মাদ্রাসা করবার প্রয়াস বেড়েছে। খুব প্রশংসার কথা : কিন্তু তাতে তৈরি হচ্ছে কি? তাতে শিক্ষাপ্রীতি না বেড়ে বেড়েছে শিক্ষার প্রতি বিতৃষ্ণা ; তাতে জ্ঞানের উদারতা ও শক্তি না বেড়ে বাড়ছে ধর্মান্ধতা ও আত্মপ্রবঞ্চনা ; তাতে সত্য-অনুসন্ধিৎসা না জেগে জাগছে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা ; পরধর্মের নিকৃষ্টতা প্রমাণের জন্য আকুল আগ্রহ ; স্বধর্মের প্রতি অন্ধ অনুরাগ ; অজ্ঞতার কুয়াসায় আচ্ছন্ন আত্মপরিতৃপ্তি ও নিজকে সবচেয়ে নিরাপদ মনে করে ইৎমিনানে থাকার মনোবৃত্তি ; বাহ্যিক পরিচ্ছদ দিয়ে অন্তরের দৈন্য লুকিয়ে লালন করবার নির্লজ্জতা এবং তাতে বাড়ছে নৈতিক ভীরুতা (moral depravity), স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি হৃদয়হীনতা, জ্ঞানার্জনে পরাজ্মুখতা ও ব্যক্তিত্বহীনতা। মাদ্রাসা বা উচ্চতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মৌলবি সাহেব আজ বড় জোর একজন সবরেজিস্ট্রার আর না হয় কোন মাদ্রাসার হেড মৌলবির বেশি ক্ষমতা রাখেন তার প্রমাণ দিতে সক্ষম হচ্ছেন না। এর উত্তরে মাদ্রাসাপন্থী ছাত্র বলে উঠবেন, কি? এতবড় কথা। আমরা খাদেমুল ইসলাম সমিতির পুরস্কার লাভ করছি, মুসলিম সমিতির বক্তৃতায় পুরস্কার পাচ্ছি, আমরা মিটফোর্ড মেডিকেল কলেজে ভর্তি হচ্ছি। আর কি চাই?" তোফা জবাব ! যদি বলা হয় তোমরা ত মেডিকেল কলেজে ঢুকবার শক্তিলাভ করতে পারছ না ও পারবে না, তাহলে চুপ—নাহয় আস্ফালন করে উঠে বলবে, "হবে, সব আস্তে আস্তে।" এই যে ভুলকে ভুল বুঝেও স্বীকার করতে আমরা কুণ্ঠিত এতে কেমন করে আমাদের ভবিষ্যত সুন্দর হবে। আমরা আজ বড় ডাক্তার চাই আমাদের জীবন বাঁচাবার জন্য, আমরা চাই বড় ইঞ্জিনিয়ার আমাদের শ্রীসম্পদের ভাণ্ডার বড় করবার জন্য, আমরা চাই বড় উকিল আমাদের ফাঁসিকাষ্ঠ হতে খসিয়ে আনবার জন্য, আমরা চাই বড় বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক আমাদের জীবন সৌষ্ঠবশালী করে তুলবার জন্য। মাদ্রাসা শিক্ষা কি সে প্রয়োজন নিবারণ করতে পারবে? সে potentiality (সম্ভাবনা) কি এই শিক্ষা-প্রণালির মধ্যে আছে? নাই, নাই—তবু সমাজ তাই আঁকড়ে ধরছে আর স্বার্থপর নেতৃবৃন্দ বলছেন, 'বেশ, মাদ্রাসা খুব ভাল কাজই করছে।' এই নিষ্ঠুর আত্মপ্রবঞ্চনা হতে আমাদের মুক্তি কে দেবে? সরকার ত মনে মনে বেশ খুশী হয়েই

অজস্র টাকা ব্যয় করছেন আর বলছেন, "বাহ্ বা বাহ্! বেশ, বাছা সকল! খুব ঘুমিয়ে থাক, আমরা একটু ঘর সংসার করে নেই। আমরা ত জানি জ্ঞান বাড়লে তোমরা চঞ্চল হয়ে উঠবে। সে জ্ঞানের শরাব তোমাদের পক্ষে যত দুর্লভ হয় ততই আমাদের মঙ্গল। সত্যই জ্ঞান না হলে মুক্তি অসম্ভব। মাদ্রাসা সে জ্ঞানের পথ রোধ করছে। এম. ই. স্কুলের পাশে পাশে জুনিয়ার মাদ্রাসা খাড়া হয়েছে আর উর্দু, বাংলা, আরবির চাপে শৈশবেই শিক্ষার্থীর মেরুদণ্ড ও মস্তিষ্ক নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। গণতি করে দেখা যাক, আমি খুব জোর করেই বিশ্বাস করি, শতকরা অন্তত ষাটজন জুনিয়ারের ছাত্র শেষ শ্রেণীতে উঠবার আগেই শিক্ষার খাতা হতে চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। আর যারা উত্তীর্ণ হচ্ছে মুষ্টিমেয় কয়টি সিনিয়র মাদ্রাসায় পড়বার জন্য তাদের অনেকেই সংস্থান করতে পারছে না। এই যে বিপুল অপচয় এর জন্য দায়ী কে? সরকার একটী জুনিয়র মাদ্রাসায় যে টাকা সাহায্য করেন তার সিকিও একটী এম. ই. স্কুলে দেন না। এই সুযোগ নিয়ে আজকাল অনেক বেকার-পীড়িত বুভুক্ষু মৌলবি সাহেব যেখানে সেখানে গিয়ে জুনিয়ার মাদ্রাসা খুলে পেটের জোগাড় করতে শুরু করছেন। একটা জুনিয়ার মাদ্রাসায় ৫০ টাকা হতে ১২০ টাকা পর্যন্ত মাসিক সাহায্য দেওয়া হয়। এতে আরও মাদ্রাসা বাড়বে না কেন? ফলত একটী মাদ্রাসায় যে ব্যয় হয় তাতে ৪টা এম.ই. স্কুল চলতে পারে। এত ব্যয় করবার কারণ, সরকার চান প্রিমিয়াম দিয়ে মুসলমানের নির্বুদ্ধিতা, গোঁড়ামি ও কুসংস্কারকে পাকা করে তাকে অধিকতর নিরুপায়, দুর্বল, ভীরু, ভণ্ড ও মূক (uncritical) করে রাখতে। মুসলমান ও মধ্যযুগের ইসলামী কৃতিত্বের মোহমুগ্ধ আছেই, তার সেই জোশের সুযোগ নিয়ে তিনিও তার মতলব হাসিল করছেন। ভারতবাসী যখন লবণের ট্যাকস তুলে দিতে চায়, ম্যানচেস্টারের কাপড়ের উপর শুলক বসাতে চায়, ব্রিটিশ সৈন্যের রসদ খরচ কাটতে চায়, অভারতীয় কর্মচারীর বেতন কমাতে চায় তখন সরকার উদ্বিগ্ন হয়ে অভিভাবকের দায়িত্বের দোহাই দিয়ে সে দাবির ভুল বুঝাতে কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু এই মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য সরকার একটু টু শব্দ করেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা চাইলে তিনি অভিভাবক হয়ে দাঁড়ান কিন্তু মুসলমানের ভুলটা সম্বন্ধে তিনি কথা বলতে চান না। তখন তিনি মুসলমানের শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে তার স্বাধীনতায় হানা দিতে চান না। পক্ষান্তরে, জমিদারের অত্যাচারে যখন মুসলমান প্রজার স্বাধীনতা গোল্লায় যায় তখন সরকারের খোঁজ পাওয়া দুষ্কর। প্রাথমিক শিক্ষা দ্বারা মুসলমান কৃষককে সম্পদ বৃদ্ধির একটী কার্যকর উপকরণে পরিণত করা যে তার জীবনের জন্য আজ প্রয়োজন হয়েছে তা সরকার স্বীকার করেও করছেন না। কারণ তাঁরা জানেন ভারতের শিক্ষিত কৃষক একটী ভয়ানক শত্রুতে (potential danger) পরিণত হবে। কিন্তু তাদের বেশ হোশ আছে যে, মাদ্রাসার মৌলবি বেশ ভীরু ও জ্ঞান-বিবেকবর্জি—তাকে দাস করে রাখা আদৌ শক্ত হবে না। সামান্য প্রলোভনেই তার আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তিলাভ করবে। অমুসলমান ভারতীয়ের বিরুদ্ধে মুসলমান ভারতীয়ের বিদ্বেষ লালন করবার জন্য মৌলবির আবশ্যক। তাঁদের তা বেশ জানা আছে। মৌলবিদের আগেকার কাজ ছিল এই দেশের মুসলিম কানুন ব্রিটিশ শাসনকর্তাদের গোচরীভূত করা। এখন তাদের কাজ হয়েছে ব্রিটিশের হাত ধরে মুসলমানকে

অধিকতর ধর্মান্ধ করে তোলা। অবশ্য একথা স্বীকার করতে হবে যে, ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধে আবুল কালাম প্রমুখ কয়েকজন আরবি শিক্ষিত পুরুষই মুসলমানের গৌরব বজায় করেছেন। কিন্তু তাঁদের মত লোককে আমি যাঁদের মোল্লা বা মৌলবি নামে অভিহিত করেছি তাঁদের শ্রেণীভুক্ত করতে চাই না। মাদ্রাসা হতে যাঁরা বের হচ্ছেন তাঁদের অধিকাংশের কথাই আমি মনে করছি। এক্ষেত্রে একটা কথা উঠবে যে, স্কুল কলেজের ছাত্রগণই বা কি বীরত্ব ও উদারচিতের পরিচয় দিচ্ছেন। 'মোহাম্মদীতে' সম্প্রতি এই উভয় শ্রেণীর শিক্ষিত মুসলমানের পার্থক্য দেখান হয়েছে। তাঁদের রায় অনুসারে কোন প্রকার শিক্ষিতের কদর ও সার্থকতা বেশি তা আপনারা অনুমান করে নেবেন। তার উতর না দিয়ে শুধু এইটুকু ইঙ্গিত করলেই যথেষ্ট হবে যে, আজ বাঙালি মুসলমান সমাজ যাঁদের নিয়ে গর্ব করছে ও যাঁদের মুখপত্র করে জগতের সামনে পেশ করছে তাঁদের প্রায় সেণ্ট-পার্সেন্ট ইংরেজি শিক্ষিত এবং তাঁদের জীবনধারা আরবি শিক্ষিতের জীবনধারা হতে ঢের পৃথক এবং অনেক স্থলেই হাদিস কোরাণের বরখেলাপ। তবু তাঁরা মুসলমান সমাজের গৌরব স্থল। আজ ইংরেজি শিক্ষিতের মর্যাদা হয়ত আশানুরূপ হচ্ছে না কিন্তু তবু তাদের বিচার বুদ্ধি, কর্মশক্তি, সৌন্দর্য-জ্ঞান, রুচি, জ্ঞান-পিপাসা, উদার-চিন্তা, পড়শী-প্রীতি আরবি শিক্ষিতের চেয়ে ঢের বেশি তা জোর করেই বলতে হবে। তার কারণ শিক্ষার প্রণালি পৃথক বলে উভয়ের 'মরতবা' ও 'মরুয়ৎ' পৃথক পৃথক। যে সমস্ত বিষয় পড়লে রুচি-জ্ঞান সমৃদ্ধ হয়, মস্তিষ্ক প্রখর ও প্রবৃতি সংযত হয়, আকাঙ্ক্ষা শাণিত হয়, সৌন্দর্যের স্বপ্ন জমে উঠে, কল্পনা উদ্দীপিত হয় সে সমস্ত বিষয়ের স্থান মাদ্রাসার পাঠ্য-তালিকায় নাই—আবার যে বিভিন্ন সমাজের শিক্ষার্থীর সংসর্গে থাকলে চরিত্র সংযত হয় ও মানসিক সংকীর্ণতা দূরীভূত হয়—সে সংসর্গ মাদ্রাসায় নাই। অথচ যে ইসলামের ইতিহাস নিয়ে আমরা গর্ব করি ও আস্ফালন দ্বারা বিধর্মীকে নিরুত্তর করতে দাম্ভিকতার আশ্রয় গ্রহণ করে থাকি সেই ইতিহাসেই দেখতে পাওয়া যায় বাগদাদ ও কর্দোভার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দ্বার য়িহুদি খ্রিস্টান প্রভৃতি অমুসলমান ছাত্রের জন্যও সমানভাবে খোলা ছিল। শুধু তাদের জন্য দ্বার অবারিত ছিল তা নয়, তাদের জন্য উপযুক্ত বৃতিরও ব্যবস্থা ছিল। সেই উদার ইতিহাসের গর্বে গর্বিত আমরা আজ ঢাকার ইসলামিক কলেজ ও কলিকাতার ইসলামিয়া কলেজের দ্বার অমুসলমানের জন্য রুদ্ধ করে রেখেছি।

এই যে ব্যবস্থা এতে অমুসলমানের কিছুই এসে যাবে না, কিন্তু মুসলমানের সমূহ ক্ষতি যে হবে তাতে সন্দেহ নাই। মুসলমান ছাত্রগুলি সব কূপমণ্ডুক হবে ও জ্ঞানোদ্ভাসিত অমুসলমান ছাত্রের সামনে তারা মুশড়ে পড়বে। তারা নিয়ত মুসলমানি হাসি, মুসলমানি কাশি, মুসলমানি পোষাক, মুসলমানি ভাষা, মুসলমানি চিন্তা, মুসলমানি আদব কায়দা, মুসলমানি গালি দুরস্ত করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে মন ও মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধি করতে পারবে না। ফলে মুসলমান যে কি জীবে পরিণত হবে তা আপনারা একবার ভাববার চেষ্টা করবেন—এইরূপ বাহ্যিক রূপ দুরস্ত করতে গিয়ে মনের দরজা, জ্ঞানের দরজা একবারে রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে—তাই আমার আশঙ্কা। বাস্তবিক পক্ষে, এবিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা কি নেই? দেড় শত দুই শত বৎসর ধরে মাদ্রাসাগুলিতে যে 'মুসলমানি' তমিজ শেখাবার জন্য কোশেশ করা হয়েছে তার কি ফল

পাওয়া গেছে? সমাজের রাজপথে সে মাদ্রাসার সৃষ্টিগুলির চেহারা দেখতে পাওয়া যায় না। গোমরাহির অন্ধকারে ঘুরে ঘুরে তাঁরা জীবন কাটিয়ে চলেছেন সমাজের বোঝাকে আরও ভারাক্রান্ত করে। আজ আবার তা-ই আমরা experiment করতে শুরু করলাম—তাতে যে ফল হচ্ছে তা কি আমাদের চোখে পড়ছে না? আর যে ফল হবে তা কি আমরা অনুমান করতে পারি না? তবু আমরা সোয়াস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বলছি, "বেশ হচ্ছে, আজ আমরা বেশ টুপি পরতে শিখছি।"

এদিকে স্কুল কলেজগুলিতে মুসলমানের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। আপনারা হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন, সাধারণ Matriculation পরীক্ষায় এবার মুসলমান কত কম কৃতকার্য হয়েছে। গত বৎসরের চেয়েও কম। এর হয়ত এক কারণ এই হতে পারে যে, মুসলমান পরীক্ষা দিয়েছে বেশি কিন্তু কৃতকার্য হয়েছে কম। কিন্তু আমি তা স্বীকার করি না। আমার ধারণা পরীক্ষা দিয়েছে যারা তাদের সংখ্যাই কম। কম হওয়ার কারণ—দেশে জুনিয়ার মাদ্রাসা ছড়িয়ে পড়ায় এম. ই. বিদ্যালয়গুলি হতে মুসলমান ক্রমশ খসে পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে High School গুলিতেও তাদের সংখ্যা কমছে। কাজেই Matriculation পরীক্ষায় তাদের সংখ্যা কম হওয়া অনিবার্য। এর মারাত্মক ফল এই যে, I Sc Class, B. Sc. Class, Medical College, Engineering প্রভৃতি শিক্ষাকেন্দ্রে মুসলমান একেবারে গর হাজির হচ্ছে। এই গরহাজির হওয়ার পরিণাম মুসলমান জাতির উত্থানের পক্ষে কতখানি সাংঘাতিক তা ভাবলে অস্থির হয়ে পড়তে হয়। এতে আমাদের রাষ্ট্রীয় সমস্যার কিছুতেই সমাধান হতে পারবে না। দ্রুত অগ্রগামী হিন্দু সম্প্রদায়ের সহিত রাষ্ট্রীয় সমন্বয় (Political adjustment) সাধন করা দুষ্কর হবে। অবশেষে আমরা রাষ্ট্রের দিক থেকে একটী পতিত জাতি Political pariahs or Helots হয়েই থাকতে বাধ্য হব। আমাদের অধঃপতন অগ্রগামী (progressive) হিন্দু জাতিকে আর কতকাল পিছনে টেনে রাখবে? বেশি দিন নয়। তাই আজ আমাদের সতর্ক হতে হবে।

পুরাতন মাদ্রাসা-উত্তীর্ণ ছাত্র সমূহ শিক্ষকতা ও মোল্লাকি দ্বারা উঞ্ছবৃত্তি করা ছাড়া আর কোন উল্লেখযোগ্য পেশার উপযোগী যে হতে পারেন, তার সন্তোষজনক প্রমাণ আজও তাঁরা দিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে, তাঁরা আধুনিক জ্ঞানালোক হতে বঞ্চিত হওয়ায় গোঁড়ামি-চর্চায় সমাজজীবনে মুক্তির পথ রুদ্ধ করছেন। নব-মাদ্রাসা উত্তীর্ণ ছাত্রগণও তাঁদের প্রাচীন-পন্থী ভ্রাতৃবৃন্দের চেয়ে খুব উন্নত হতে পারছেন, তাও বোধ হচ্ছে না। হয়ত তাঁরা চলাফেরায়, পোষাক পরিচ্ছদে, হাবভাবে অনেকখানি দড় (smart) হয়েছেন, কিন্তু শিক্ষায় যে তাঁদের চেয়ে উন্নত হয়েছেন তার প্রমাণ তাঁরা দিতে পারেন নাই। দুই একজন হয়ত দুই একটী বড় চাকরি পেয়ে থাকবেন বা দুই একজন Medical Schoolএ ভর্তি হয়েছেন কিন্তু সাধারণত তাঁরা আধুনিক জগতে চলবার মত বিশেষ যোগ্যতা লাভ করতে পারছেন না। তাঁরা Medical School এ হয়ত যেতে পারছেন কিন্তু কস্মিনকালেও যে Medical College এ ঢুকতে পারবেন না, তা তাঁরা উপলব্ধি করছেন বলে মনে হয় না। অন্যান্য বিভাগে প্রবেশ করা ত দূরের কথা যেখানে বিজ্ঞান-চর্চার আবশ্যকতা আছে এবং যেখানে জীবনায়োজন সংগ্রহের কায়দাকানুন শিক্ষা করতে হয়।

প্রকৃত শিক্ষার লক্ষণ হচ্ছে মন ও হৃদয় বৃত্তির সমধিক স্ফূর্তি (development), অপরিচিত অবস্থার মধ্যে শক্তি প্রয়োগ করবার যোগ্যত্ব (capacity), নব নব সমস্যায় নব নব সমাধান উদ্ভাবনে সক্ষমতা (resourcefulness) ও জাতি ধর্মনির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের প্রতি প্রীতি (love of humanity) প্রদর্শনে জাগ্রত সহৃদয়তা ও প্রবৃত্তি। এসব লক্ষণ দ্বারা test করলে নব মাদ্রাসার শিক্ষা যথেষ্ট বলে প্রমাণ করা যায় না।

এই শিক্ষা যে জীবন-সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট নয় তার বড় প্রমাণ এই যে, অনেকেই আজ মাদ্রাসা হতে উত্তীর্ণ হয়েই সাধারণ ইস্কুল কলেজে ঢুকবার জন্য ছুটেছে। এতেই এই Scheme অবশেষে ব্যর্থ হবেই, (The Scheme will kill itself) কিন্তু তার পূর্বেই বাঙ্গালি মুসলমানের এমন সর্বনাশ হবে যে, তা আর শোধরান যাবে না। সুখের বিষয়, প্রিন্সিপাল খান বাহাদুর মৌলবি মুহম্মদ মূসা সাহেব তাঁর বার্ষিক Report-এ এই Warning এর ইঙ্গিত করেছেন। জীবন সংগ্রামে এই মাদ্রাসা শিক্ষা এত অপর্যাপ্ত যে, সংস্কারের পূর্বে মুসলমান সংগ্রামে হটে হটে নিস্তানাবুদ হতে থাকবে ; কোন স্থানেই আর ঠাঁই করতে পারবে না। একবার বিলম্বে আরম্ভ করে তারা দেখছে হিন্দু আজ সর্বত্র জায়গা জুড়ে বসেছেন। আর এই শিক্ষাপ্রণালির ফলে তাঁরা আর একেবারেই ঠাঁই করতে পারবে না। এ যাবত আমাদের অযোগ্যতা বা অল্পযোগ্যতার সঙ্গে সরকারের হাত লাগান ছিল, কিন্তু যত দিন যাবে ততই সে হাত শিথিল হতে থাকবে ; অথচ ক্রমশ অধিকতর যোগ্যতার প্রয়োজন হবে। সুতরাং মুসলমানের অবস্থা কি হবে তা সহজেই অনুমেয়।

এমত অবস্থায়, আমাদের সত্বর এমন একটা ব্যবস্থা করা আবশ্যক যাতে করে আমাদের শিক্ষা একমুখী (Unitary System) হয় ; আমাদের সময় ও অর্থ অযথা নষ্ট না হয় অথচ উন্নত হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমরা সমান যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হওয়ার সুযোগ করতে পারি।

অনেকে মনে করছেন, এই নব মাদ্রাসার কিছু কিছু সংস্কার করলেই বেশ হবে। কিন্তু আমার মনে হয় তা হবে না। কারণ সমস্ত স্কিমটাই একটা ভুল ধারণা ও ভুল উদ্দেশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এর আগাগোড়া সংস্কার আবশ্যক।

একথা সত্য যে, মুসলমান তার একটা বিশিষ্ট Culture ও সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখতে ব্যস্ত ; অথচ তাকে ভারতবর্ষে হিন্দু পড়শীর সহিত একত্র বসবাস করতে হবেই—তাঁর প্রভাব একেবারে এড়িয়ে গেলেও চলবে না। এর উপর আবার ইংরেজ শাসনের প্রভাব। এই তিনের সামঞ্জস্য রক্ষা করে এই শিক্ষা প্রণালির সংস্কার করতে হবে। এক কথায়, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান আর ইসলামের Culture একত্র সংযোগ করতে হবে। ব্যাপারটা খুব গুরুতর তাতে আর সন্দেহ নাই। কাজেই সমাজের শক্তিমান নেতৃবর্গের মস্তিষ্ক ও দূরদৃষ্টি প্রয়োগ করে এই শিক্ষা-সংস্কার অতি সত্বর করা আবশ্যক।

বর্তমান মাদ্রাসা স্কিমে সরকার পক্ষ কোন আপত্তি তুলছেন না। কারণ সরকার পক্ষের তাতে লাভ ছাড়া লোকসান নাই। মুসলমান অর্ধশিক্ষিত বা কুশিক্ষিত থাকলে বিদেশী শাসন সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব কিছু বেশিদিন বেঁচে থাকতে পারবে। শিক্ষার অসমতা unequal

education অনুন্নত সম্প্রদায়কে উন্নত সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা-প্রচেষ্টায় সর্বদা মস্ত বড় অন্তরায় করে রাখে। উভয় সম্প্রদায়ের Political outlook বা ideal এমত অবস্থায় এক হতে পারে না। ভয় ও সন্দেহ অনুন্নত সম্প্রদায়কে উন্নত সম্প্রদায়ের সাধনার পথে কাঁটা স্বরূপ করে রাখে। এজন্য আজ আমাদের হিন্দু মুসলমান নেতৃবৃন্দের কর্তব্য মুসলিম বাংলার শিক্ষাকে উন্নতধরণে সংস্কার করার চেষ্টা করা। এতে পক্ষান্তরে আমাদের দুর্ভাগা দেশের স্বাধীনতা অর্জনের পথ অনেকখানি সহজ করে তুলা হবে।

অবশ্য একথা স্বীকার করতে হবে শিক্ষা বিভাগের দু-একজন সহৃদয় কর্মচারী যথা ডঃ জেঙ্কিনস ও মিঃ সার্প এই স্কিমকে নাপসন্দ করেছেন এবং মুসলমানের ভবিষ্যত এতে খারাপ হচ্ছে তাও তাঁরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। দুঃখের বিষয়, সেজন্য তাঁরা মুসলমানের শত্রু বলে গণ্য হয়েছেন। কিন্তু একদিন তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হবেই। সুখের বিষয়, ইতোমধ্যেই সমাজের দুএকজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি এই স্কিমের কুফল সম্বন্ধে অবগত হয়ে সমাজকে হুশিয়ার করতে চাচ্ছেন। আশা করি, সত্বরই তাঁরা তাঁদের বাতিনী মতামত জাহির করে শিক্ষা সংসারের একটী আন্দোলন কার্যকর করে তুলতে প্রস্তুত হবেন এবং এই আন্দোলনে পড়শী হিন্দু সম্প্রদায়ের হৃদয়বান প্রখর-মস্তিষ্ক ব্যক্তিবর্গের সহযোগ লাভ করতে হবে। নতুবা ষোলআনা ফল পাওয়া অসম্ভব হবে বলে আমার বিশ্বাস।

পূর্বে আমি বলেছি আমাদের শিক্ষা একমুখী করতে হবে এবং কেমন করে করা দরকার তা ভাবতে হবে। আজ আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি অনুসারে এ সম্বন্ধে যা ভেবেছি তাই লিপিবদ্ধ করব।. ভরসা, সমাজের যোগ্যতর ব্যক্তিগণ সত্বর এসম্বন্ধে তাঁদের চিন্তা কেন্দ্রীভূত করবার জন্য প্রবৃত হবেঁন।

আমার মতে যে সমস্ত মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার একটীও নষ্ট করবার প্রয়োজন নাই। কেবল পাঠ্যতালিকা, policy ও outlook পরিবর্তন করলেই কাজ হাসিল হবে। এখন পাঠ্যতালিকা কিরূপে পরিবর্তন করা যায় তাহাই বিবেচ্য ও বিচার্য।

আমাদের সর্বপ্রথম দেখতে হবে এই সমস্ত মাদ্রাসা হতে যে সমস্ত ছাত্র উত্তীর্ণ হবে তারা যেন দুনিয়ার বুকে পা শক্ত করে দাঁড়িয়ে বেশ স্বচ্ছন্দচিত্তে রীতিমত আলো-বাতাস উপভোগ করতে পারে। তাদের মস্তিষ্ক, হৃদয় ও শরীর এই তিনের যথাযথ বিকাশ-সাধন করাই আমাদের উদ্দেশ্যে। আবার যে সমস্ত হতভাগ্য উচ্চ শিক্ষা লাভে সমর্থ হবে না তাদের এমন এক একটী বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া দরকার যার উপর নির্ভর করে তারা জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে এও দেখতে হবে যে, প্রত্যেক শিক্ষিত মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত না হলেও ধর্ম বিষয়ে ও নিজেদের ইতিহাস ও Culture সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞানলাভ করতে সমর্থ হয় অথচ অন্য ধর্মাবলম্বীদের সহিত উদার ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত না হয়।

এই কয়টী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমি একটী পাঠ্যতালিকার খসড়া (skeleton) সমাজের বিচারার্থে খাড়া করতে দুঃসাহসী হচ্ছি। আশা করি, এই খসড়া অবলম্বন করে অবিলম্বে যুক্তি-তর্ক আলোচনা-সমালোচনা চারিদিকে শুরু-হবে এবং অবশেষে একটী সুন্দর যুগধর্মসঙ্গত পাঠ্যতালিকা (Curriculum) নির্দ্ধারিত হবে।

এই পাঠ্য তালিকা নির্ধারণ করবার পূর্বে আমাদের কতকগুলি সমস্যার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরা যেতে পারে ১. ভাষা সমস্যা ২. রাষ্ট্র সমস্যা ৩. ধর্ম সমস্যা ও ৪. সমাজ সমস্যা। ভাষা সমস্যা নিয়ে বড় বিব্রত হয়ে পড়তে হয়। ইংরেজি আমাদের রাজভাষা—তা শিখতেই হবে। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা—তা উপক্ষো করা আত্মঘাতী। আরবি বা সংস্কৃত আমাদের ধর্মভাষা—তা ছেড়ে দিলে ধর্মহীন হওয়ার আশঙ্কা—তা শিখতেই হবে। এর উপর আবার হিন্দি বা উর্দু Lingua Franca যা না শিখলে আমাদের রাষ্ট্রীয় ঐক্য political unity কার্যকর হবে না। অতএব দেখা যাচ্ছে প্রত্যেক বাঙালির তথা ভারতবাসীর চারিটী ভাষা শেখা অবশ্য কর্তব্য। অনেকে হয়ত মনে করতে পারেন চারিটী ভাষা শেখা কি সহজ কথা! কিন্তু আমার মনে হয় ভারতবাসীর পক্ষে চারিটী ভাষা শেখা কিছুই শক্ত হবে না। যদি সময়মত ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা করা হয়। কোন একজন জার্মান linguist বলেছেন, "ভাষাশিক্ষার জন্য দুইটা জাতির বিশেষ দক্ষতা (aptitude) দেখা যায়; Russians ও Indians-দের দক্ষতা সবচেয়ে বেশি। কারণ প্রকৃতিই তাদের সে দক্ষতা প্রখর করেছে।" Russiansরা বলে, "সাগরে পৌঁছতে হলে তাদের অনেক ভাষাভাষী দেশের মধ্য দিয়ে যেতে হয়।" এতেই ঐ উক্তিটার খানিকটা পোষকতা পাওয়া যায়। Russianদের নিচেই Indians, তারপর আধুনিক জগতে প্রত্যেক সভ্যজাতিকেই তিনের অধিক ভাষা শিখতেই হয়। প্রত্যেক ইংরেজ বালককে মাতৃভাষা ইংরেজি, Lingua franca ফরাসি, trade ভাষা German এবং Classical ভাষা Latin বা Greek শিখতেই হয়। প্রত্যেক জার্মান বালককে মাতৃভাষা German, Trade ভাষা ইংরেজি, Lingua france ফরাসি, Legal ভাষা Latin, Classical ভাষা Greek মোট পাঁচটী ভাষা শিখতে হয়। কাজেই আমাদের aptitude থাকা সত্ত্বেও আমরা চারিটী ভাষা শিখতে পশ্চাদপদ হব কেন? বস্তুত উর্দু বা হিন্দি শেখা কিছুই শক্ত নয়। আরবি বা সংস্কৃত সময় মত পাঠ্য বিষয় করলে কাহারও পক্ষে কঠিন হবে না। আধুনিক প্রণালিতে ভাষা শিক্ষা দিলে চারিটী কেন দশটী ভাষাও শেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্র সমস্যা সম্বন্ধে একথা বললেই চলবে যে ইংরেজদের সংস্পর্শ ত্যাগ করা যখন আপাতত আমাদের পক্ষে কঠিন এবং যুক্তিসঙ্গত নয় তখন তাঁদের জ্ঞানগুণ অর্জন করবার জন্য তাঁদের আদর্শ আমাদের অনুকরণ করাই শ্রেয়। তবে সকল ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় আদর্শ এক হওয়া কর্তব্য। এক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোন পার্থক্য বা বিরুদ্ধ মনোভাব থাকা উচিত নয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সেই আদর্শ হৃদয়ে পোষণ করতে এবং তদনুসারে দেশের মুক্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা করতে শেখে, শিক্ষাকেন্দ্রে তার ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের পার্থক্য থাকবেই। তবে শিক্ষার্থীর মনোভাব এমন করে গড়তে হবে যাতে ঐ পার্থক্য আমাদের কল্যাণের বা মুক্তির পথে বিঘ্ন না হয়ে বরং সহায় হতে পারে। প্রত্যেক ধর্ম ও সমাজ-পদ্ধতির শাসনাধীনে একটী চরিত্রগত দৃঢ়তা লাভ করা যায়। সেটী আমাদের জাতীয় জীবনের সম্পদ। কিন্তু সে সম্পদ লাভ করতে হলে শিক্ষাকেন্দ্রে যাতে ঐ বিশ্বাস ও আচারে প্রাণ সঞ্চার হয় তার উপযুক্ত ব্যবস্থা

করতে হবে। জ্ঞান ও প্রীতিই সে প্রাণের জননী। সুতরাং হিন্দু মুসলমানকে সাধারণ শিক্ষাকেন্দ্রে একত্র বসে সে জ্ঞান ও প্রীতি অর্জন করা সর্বপ্রথম কর্তব্য। পৃথক পৃথক মনোভাব দিয়ে পরিচালিত পৃথক পৃথক সাম্প্রদায়িক শিক্ষাকেন্দ্রে আবশ্যকীয় জ্ঞান ও প্রীতির চর্চা সম্ভবপর হবে না ; আবার তা না হলে আমাদের রাষ্ট্রীয় মনোভাব (political outlook) বীর্যবন্ত হবে না। হিন্দু মুসলমানকে Protestant ও Catholic এর সঙ্গে তুলনা করা চলে না।

এখন পাঠ্যতালিকার একটী সংক্ষিপ্ত outline দেওয়ার চেষ্টা করব। এস্থলে আর একটী সমস্যার কথা মনে পড়ছে। সেটা হচ্ছে পাঠ্যপুস্তকের অভাব। নূতন Curriculum এর জন্য নূতন বিষয় অবলম্বনে নূতন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করার দরকার হবে। সে সমস্ত পুস্তক চেষ্টা করে উপযুক্ত লোকদ্বারা প্রণয়ন করাতে হবে। তার জন্য ভিন্ন কমিটী করে নূতন নূতন পুস্তক তৈরি করা যেতে পারে। হায়দ্রাবাদে যেমন উর্দুগ্রন্থ তৈরি হচ্ছে তেমনি নূতন Curriculum এর জন্য নূতন পুস্তক তৈরি করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। চেষ্টা না করলে কোন সংস্কারই সম্ভবপর হবে না।

বলা বাহুল্য, শিক্ষার চারিটী স্তর (stage), Primary, Secondary, Intermediate ও University. Primary stage এ ছয় বৎসর ; Secondary stage এ চারি বৎসর ; Intermediate stage এ দুই বৎসর এবং University srage এ চারি বৎসর ব্যাপী পাঠ্যতালিকা দীর্ঘ হওয়া কর্তব্য। এতদ্ব্যতীত Law, Medical ও Engineering বা অন্যান্য Technical line এর কথা স্বতন্ত্র। এদেশে পাঁচ বৎসরই Minimum School going age ধরা যেতে পারে।

এস্থলে মাদ্রাসা ব্যতীত সাধারণ স্কুল-কলেজের শিক্ষার কয়েকটী দোষ উল্লেখযোগ্য। যে দোষগুলির প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রেখে এই শিক্ষা সংস্কার করতে হবে। সেগুলি এই :

১. আধুনিক শিক্ষিত ছাত্র ধর্ম ও নীতি বিবর্জিত।
২. আধুনিক শিক্ষিত মুসলমান মুসলিম-কালচার ও ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞ।
৩. আধুনিক শিক্ষিত ছাত্র স্বাস্থ্যহীন।
৪. আধুনিক শিক্ষিত ছাত্র জীবিকার্জনে শ্রমবিমুখ ও নিরুপায় অর্থাৎ বেকার—নব সমাধান-উদ্ভাবনে অক্ষম (impotent.)
৫. আধুনিক প্রাইমারি বিদ্যালয়ের ছাত্রকে কোন শিল্প শেখানো হয় না।

আমার প্রস্তাবিত নিম্নলিখিত পাঠ্যতালিকা কার্যকরি করতে হলে সর্বপ্রথম একথা মনে রাখতে হবে যে মাদ্রাসাগুলি সমানভাবে হিন্দু মুসলমানের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। মুসলমানের মাদ্রাসা হিন্দুদের সোহবৎ হতে একেবারে আলগ করলে আমাদের পক্ষে আত্মঘাতী হবে। আমরা সাধারণ প্রতিযোগিতার আদর্শ হতে পৃথক থেকে পূর্ণবিকাশ লাভ করতে পারব না। উভয় জাতির পরস্পর মিলন ও প্রীতি অত্যাবশ্যকীয়। তজ্জন্য স্কুল কলেজ পৃথক হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। প্রাচীন খলিফাদের যুগে মুসলমানদের মাদ্রাসা জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের জন্যই উন্মুক্ত ছিল। আমরা কি সে আদর্শ অনুসরণ করব না? তাতে যে আমরা আরও শক্তিমান

হতে পারব। হিন্দু বা অন্য জাতির সংস্পর্শে এসে পরস্পর দোষগুণের খবর পেয়ে আমরা পরস্পরের দুর্বলতা এড়িয়ে শক্তি সঞ্চয়ে মনোনিবেশ করতে পারব। আজকার দুনিয়ায় পৃথক হয়ে থাকলে মৃত্যু অনিবার্য (aloofness is death)। ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে শিক্ষাদানকালে মুসলমান ও হিন্দু ছাত্রকে পৃথক পৃথক class এ বসান যেতে পারে ; কিন্তু সাধারণ শিক্ষাদানকালে তাদের একত্র একই class এ বসান কর্তব্য। কারণ উভয়কেই পরস্পর প্রীতির সাগরে অবগাহন করে উভয়ের অতীতকে ভুলে গিয়ে নূতন বর্তমানকে গড়ে তুলতে হবে--একথা এক মুহূর্তও ভুললে চলবে না। এই প্রীতির উপরই আমাদের সমস্ত Educational policy খাড়া করতে হবে। তবেই আমাদের নব ভারত জন্মলাভ করে বিশ্বের দরবারে গৌরবময় আসন লাভ করবে।